জঙ্গী দমনে বাংলাদেশের সাফল্য থেকে শিক্ষা

আহসান মোহাম্মদ

২০০১ সালের এগারই সেপ্টেম্বর আমেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলা এবং তার জের ধরে আফগানিস্তান ও ইরাক দখল করা হলে সারা বিশ্বে মহামারীর মত জঙ্গীবাদ ছড়িয়ে পড়ে। জঙ্গীবাদের কবল থেকে আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্সের মত দেশ যেমন বাঁচতে পারেনি, তেমনি এর থেকে দূরে থাকতে পারেনি ভারত, ইন্দোনেশিয়া, সউদী আরব কিংবা পাকিস্তান। অবশ্য এ উপমহাদেশে জঙ্গীবাদ নতুন কিছু ছিল না। ভারত, শ্রীলঙ্কা ও নেপাল দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গীবাদে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আসছে। তার মধ্যে আবার ভারতের দুর্নাম রয়েছে প্রতিবেশী দেশগুলোতে জঙ্গীবাদ রফতানী করার। কিন্তু বাংলাদেশ এ যাবত জঙ্গীবাদ থেকে একরকম মুক্তই ছিল। এক বছর আগে জাতিকে গভীর সংকটে ঠেলে দিয়ে জঙ্গীবাদের উত্থান ঘটলেও অতি দ্রুত আমরা তা মোকাবেলা করি। জঙ্গীবাদ দমনে বাংলাদেশের সাফল্য থেকে একদিকে যেমন এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশসমূহ এমনকি সারা বিশ্ব শিক্ষা নিতে পারে তেমনি এখানে আবার যেন জঙ্গীবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে তা নিশ্চিত করতেও এ শিক্ষা কাজে লাগানো যেতে পারে।

এক বছর আগে যখন বাংলাদেশের একটি বাদে সকল জেলায় একযোগে সিরিজ বোমা হামলা হয় তখন হতভম্ব হয়ে পড়ে বাংলাদেশ। জঙ্গীবাদীদের একটি চক্র যে বিতরে ভিতরে বেড়ে উঠেছে তা এই প্রথম সকলে টের পায়। এর পূর্বে জঙ্গীবাদের উত্থানের বিষয়ে যে কেউ কিছু বলেনি তা নয়। কিন্তু তীব্র রাজনৈতিক বিভক্তি, দলীয় স্বার্থ তাড়িত মিডিয়া ও সকল কিছুতে দোষারোপের খেলার দেশে সে সকল অভিযোগ বা উদ্বেগকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করার প্রচেষ্টা হিসাবেই অনেকে দেখেছেন। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে উদীচি ও রমনা সহ বেশ কয়েকটি সমাবেশে রক্তক্ষয়ী বোমা হামলা ঘটে। তৎকালীন সরকার এ সকল কিছুর জন্যই জঙ্গীবাদকে দায়ী করলেও তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয়তাবাদী নেতাদেরকে দোষী করে মামলাগুলো সাজায়। উদীচি বোমা হামলার মামলার রায়ে বিচারকও একই কথা বলেছেন। ঘটনাগুলোকে অতি মাত্রায় রাজনীতিকরণের কারণে অনেকে এমন ধারণাও করতেন যে এ গুলোর পিছনে স্বয়ং তৎকালীন ক্ষমতাশীন দলের হাত ছিল। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটিও তার রিপোর্টে এ ধরণের ইঙ্গিত দিয়েছিল।

১৭ই আগস্টের সিরিজ হামলার রেশ কাটতে না কাটতে একের পর এক আত্মঘাতি বোমা হামলা শুরু হলে জাতি দিশেহারা হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের জন্য সময়টা ছিল জাতির ইতিহাসের সবথেকে ক্রান্তিকাল। অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ দেশটির আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর না আছে আধুনিক সরঞ্জাম, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ আর না আছে নৈতিক মান। পুলিশ বিভাগ সরকারের সবথেকে দুর্নীতিগ্রস্থ অঙ্গগুলোর একটি। তাদের দুর্নীতি এতো বেশী প্রকাশ্য ও বিস্তৃত এবং দুর্নীতির শিকড় এতো বেশী গভীরে প্রোথিত যে প্রায়শঃ এ বাহিনীর সদস্যদেরকে চুরি ডাকাতিতে লিপ্ত হতে দেখা যায়। অপরদিকে পনের কোটি অনুপাতে তাদের সংখ্যাও নেহায়েত কম। নাগরিক পরিচয়পত্রের মত কোন কিছু না থাকার কারণে অপরাধ সংঘঠিত করে খুব সহজেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে লুকিয়ে থাকা সম্ভব। এরকম একটি পরিস্থিতিতে যখন একদল লোক নিজেদেরে শরীরে বোমা বেঁধে বিচারকের এজলাস, জনাকীর্ণ প্রশাসনিক দফতর ইত্যাদিতে ঝাপিয়ে পড়তে শুরু করলো তখন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে বললেন যে,

আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষে আত্মঘাতি হামলা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। সরকার এতো অসহার মধ্যে পড়লো যে এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে বিরোধী দলকে সংলাপে আহবান জানালো। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারী ও বিরোধী দলের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে আলাপ আলোচনার বিষয়টি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অতি প্রচলিত থাকলেও বাংলাদেশে তা নিতান্তই অকল্পনীয়। এখানে প্রধান দুটি দলের নেত্রীদ্বয় পরস্পরের সাথে কুশল বিনিময়কেও বিষপানতূল্য মনে করেন।

জঙ্গীবাদ দমনে সংলাপের প্রধানমন্ত্রীর আহবান বিরোধী দল যে শুধু অত্যন্ত রূঢ়ভাবে প্রত্যাখান করে তাই নয়, তারা সরকারকেই জঙ্গীবাদের মদদদাতা হিসাবে দায়ী করে। তারা সরকারের অংশীদার ইসলামি দলগুলোকে নিষেদ্ধ করার দাবী জানায়। শুধু বিরোধী দল ও তাদের সমর্থক বুদ্ধিজীবি, পেশাজীবি ও মিডিয়া নয়, সরকারের কোন কোন মন্ত্রীও এ দাবী তুলতে থাকেন। এর পিছনে একদিকে যেমন ছিল আদর্শিক দ্বন্দ্ব, তেমনি ছিল জাতির চরম দুর্দিনে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের প্রচেষ্টা। বিগত নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দলটি এককভাবে সবথেকে বেশী ভোট পেলেও আসন পায় মাত্র এক পঞ্চমাংশ কেননা প্রায় সবগুলো আসনেই ইসলামপন্থী দলগুলোর ভোট ব্যাংক রয়েছে যার সহায়তায় ক্ষমতাশীন দল দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী আসন লাভ করে। তাই ক্ষমতাশীন জোটকে পরবর্তী নির্বাচনে পরাজিত করতে তাদের থেকে ইসলামি দলগুলোকে আলাদা করার বিকল্প নেই বলে সকলেই বলে আসছিলেন। প্রধান ইসলামি দলটির সাংগঠনিক ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত হওয়ার কারণে বিরোধী দলের রাজপথের আন্দেলন মোকাবেলার ক্ষেত্রে দলটি সরকারের প্রচুর সাহায্য করে থাকে। এ কারণে জঙ্গীবাদের উত্থানের সুযোগে সরকার বিরোধীরা জোট ভাঙ্গার চেষ্টা জোরদার করে। বাহির-ভিতরের চাপের মুখে সরকার সে সময় যদি ইসলামি রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কোন পদক্ষেপ নিতো, তাহলে তা দেশের জন্য চরম বিপর্যয় ডেকে আনতে পারতো। তাতে জঙ্গীবাদীরা প্রমাণ করতে পারতো যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া শতকরা পনের শতাংশ জনসমর্থনপুষ্ট ইসলামি দলগুলোর অনেক কর্মী সমর্থককে জঙ্গীদের পক্ষে তাদের দলে ভেড়ানো সম্ভব হতো। জঙ্গীবাদকে দমনের বদলে বরং তাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া হতো। আলজেরিয়ায় এ ধরণের ঘটনা ঘটেছিল। স্বাধীনতার পরপরই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের একাংশকে নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে মোকাবেলা করার ফলও হয়েছিল মারাত্মক। সে সময় সশস্ত্র আন্দোলন বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক দলগুলো ও তাদের সমর্থক মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবিরা যখন জঙ্গীবাদ থেকে রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের চেষ্টায় রত ছিল, তখন সাধারণ জনগণ এগিয়ে আসে। অল্পদিনের মধ্যে আটক হয় জঙ্গীদের সামরিক শাখার প্রধান আতাউর রহমান সানি। একে একে ধরা পড়ে তাদের শীর্ষ নেতারা।

এতো দ্রুত জঙ্গীবাদ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সাফল্যের পিছনে যে সকল বিষয়গুলো কাজ করেছে তা হচ্ছেঃ

১. এদেশে জঙ্গীবাদের পুরোটাই ছিল আরোপিত। বর্তমান সময়ে ইসলামের নামে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের মূলে রয়েছে ফিলিস্তিনের উপর ইসরাইলী দখলদারিত্ব ও তার প্রতি পাশ্চাত্যের অন্ধ সমর্থন। ইরাক আক্রমণের পর ইরাক ইস্যুও তার সাথে যোগ হয়েছে। কিন্তু এসকল এলাকা থেকে বাংলাদেশ বহুদূরে অবস্থান করার কারণে এ দেশের জনগণের উপর ইস্যুগুলো তেমন প্রভাব ফেলতে পারে না। তাছাড়া আবহাওয়ার কারণেও এদেশের মানুষ সকল সময়েই শান্তি প্রিয়তার পরিচয় দিয়ে থাকে। জঙ্গীবাদীদের কথিত দাবী - ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা - এর জন্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাজ করার কোন

বাধা এ দেশে নেই। এই একই এজেন্ডা নিয়ে অর্ধ শতাব্দীর বেশী সময় ধরে এ দেশে বেশ কয়েকটি সংগঠন রাজনীতি করে আসছে, অন্যান্য দলের সাথে জোট বেঁধে রাজপথে আন্দোলন করেছ, নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে এবং সংসদে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছে। স্বাধীনতার পর যখন দেশে ইসলামি রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয় তখনও এ সকল দলগুলো হাতে অস্ত্র তুলে নেয়নি বা কেন বেআইনী পথে পা বাড়ায় নি। এমনকি সত্তরের মাঝামাঝি ক্যু - পাল্টা ক্যুর সময়েও তারা এ সকল কিছু থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেছে। যখন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনকারী দলগুলোর বৃহদাংশ এই প্রথমবার সরকারে অংশ নেয়ার সুযোগ পেয়েছে, তারা তাদের গণতান্ত্রিক চরিত্র প্রমাণের আপ্রাণ চেষ্টা করছে এবং আমেরিকার মত পাশ্চাত্য শক্তির নিকট থেকে অমৌলবাদী ও গণতানিত্রক দল হিসাবে সার্টিফিকেট পাচ্ছে তখন জঙ্গীবাদের উত্থান যে রোপিত বা আরোপিত তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

২. আত্মঘাতি বোমা হামলা শুরু হলে সরকার যে আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছে জঙ্গীবাদ দমনে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সে সময়ে যদি তারা বিষয়টিকে রাজনীতিকরণ করতো তাহলে জাতির জন্য তা অতি মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারতো। বিরোধী দলের উপরে দোষ চাপানোর মত কিছু উপাদান যে ছিল না তা নয়। বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের মূল নায়ক শায়খ আব্দুর রহমান হচ্ছেন বিরোধী দলের যুব সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মীর্যা আযমের আপন দুলাভাই। উল্লেখ্য যে রাজনৈতিক দলের যুব সংগঠনগুলো মূলত লাঠিয়ালের ভূমিকা পালন করে থাকে। জঙ্গীবাদের অর্থ জোগানদাতা হিসাবে যাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল তিনি ছিলেন বিরোধী দলের ওলামা শাখার নেতা। অন্যান্য সময়ে রাজনীতিকরণে পিছিয়ে না থাকলেও চরম বিপদের মুহূর্তে সরকার ও সরকারী দল বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়।

৩. জঙ্গী দমনের কৃতিত্বের একটি বড় অংশ পাওনা র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান বা র‍্যাব এর। বিগত সরকারের রেখে যাওয়া চরম অবনতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সরকার নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর থেকে বাছাই করা সদস্যদেরেকে নিয়ে র‍্যাব গঠন করে। তাদেরকে উন্নত প্রশিক্ষণ ও রশদ দেয়া হয়। দেশকে জঙ্গীবাদ মুক্ত করতে সম্মুখ সমরে তারাই কাজ করেছে। পুলিশ বাহিনীর সাধারণ সদস্যদেরকে দিয়ে এ কাজ সম্ভব হতো না।

৪. ইসলামপন্থী হিসাবে পরিচিত রাজনৈতিক দল, সামাজিক, পেশাজীবি ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ও ব্যক্তিগণ এবং আলেম সমাজ জঙ্গী দমনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তারা বড় বড় সভা-সমাবেশ করে জনগণকে জঙ্গীদের বিরুদ্ধে সচেতন করে তুলেছেন। তাঁরা কোরান-হাদীস থেকে উদ্বৃতি দিয়ে প্রচার করেছেন যে ইসলামে জঙ্গীবাদের কোন স্থান নেই, জঙ্গীবাদীরা ইসলাম ও বাংলাদেশের শত্রু। সে সময়ে জঙ্গীবাদ বিরোধী কোরানের আয়াতের পোস্টারে সারা দেশ ছেয়ে যায়, মসজিদের ইমামেরা জুম্মার নামাজের পর এ বিষয়ে বারংবার জনগণকে সচেতন করতে থাকেন। এক পর্যায়ে দেশের প্রতি পাড়ায় পাড়ায় জুম্মার নামাজের পর দুই লক্ষ মসজিদ থেকে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে মিছিল বের হয়। এর ফলে একদিকে যেমন জঙ্গীদের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণকে সচেতন করে তোলা সম্ভব হয়, তাদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, তেমনি তাদের মনোবল ও ভুল বিশ্বাসেও আঘাত করা হয়। উল্লেখ্য যে এ দেশের গ্রামীন জনগণের একটি বিরাট অংশ টিভি দেখা কিংবা পত্র-পত্রিকা পড়ার সুযোগ পায় না। ফলে তাদের নিকট সরকারের বা মিডিয়ার প্রচারণা পৌছানো দুস্কর। জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সংগঠিত করেছিলেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম মুয়াজ্জিনেরা।

৫. সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সকল ধরণের চরমপন্থার সাথে কোন না কোনভাবে অর্থনৈতিক কারণ জড়িত থাকে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং অর্থ ও বিত্তশালীদের দু-একজন চরমপন্থার সমর্থক হলেও হতে পারে কিন্তু চরমপন্থা ও জঙ্গীবাদ মাঠকর্মী যোগাড় করে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে। এ সমাজ যাকে কিছুই দিচ্ছে না তাকে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়ে দেয়া সহজ। বাংলাদেশে ইসলামের সাথে দারিদ্রের একটি পুরানো সম্পর্ক থাকলেও বিগত কয়েক দশকে এ অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। ইসলামপন্থী হিসাবে পরিচিত ব্যক্তিরা ক্রমাগত অধিক হারে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করছে। তারা আর্থিক প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করছে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো জনপ্রিয় হওয়ার কারণে এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে যারা বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে বের হচ্ছে এবং সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অধিষ্ঠিত হচ্ছে তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলামি চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত। এ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সুবিধা তারা ভোগ করছে। একজন যশস্বী ডাক্তার, উচ্চপদে আসীন প্রকৌশলী কিংবা সফল ব্যবসায়ী কেন চাইবে যে তাঁর সন্তান বিনা কারণে শরীরে বোমা বেঁধে নিজ দেশকে ধ্বংসের জন্য জীবন দিক? ফলে ইসলামকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবহারের প্রচষ্টা সফল হয়নি। বরং ইসলামকে রাষ্ট্রের রক্ষাকবচ হিসাবে দেশের অধিকাংশ নাগরিক গণ্য করেছেন।

বাংলাদেশে সহসাই জঙ্গীবাদের পূনরুত্থানের সম্ভাবনা ততটা না থাকলেও যেহেতু এটি ছিল আরোপিত তাই যারা গতবার একে আরোপ করেছিল তারা যে আবার তা করবে না তা কোনভাবেই বলা যায় না। এজন্য নিরাপত্তা বাহিনীকে সদা সতর্ক রাখার পাশাপাশি জঙ্গীবাদ বিরোধী সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। জঙ্গীবাদ থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার প্রবণতা পরিহার করতে হবে। ইসলামপন্থী হিসাবে পরিচিতদেরকে সমাজের মূল ধারার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সরকার সম্প্রতি কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি ও আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার সমমান দেয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা এ ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি বাংলাদেশের বিভিন্ন দারিদ্রপীড়িত অঞ্চলের দারিদ্র দ্রুত দূর করার ব্যাপারেও কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। জঙ্গীবাদের পিছনকার অর্থনৈতিক কারণকে কোনভাবেই ছোট করে দেখা উচিৎ হবে না।